দেশবাসীকে সত্য ইতিহাস জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে

– ড. হাসনান আহমেদ

জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে অতীতের কথা বেশি ভাবতে ও বলতে ইচ্ছে করে। ছোটবেলা থেকে এদেশের ইতিহাস কতভাবেই-না শুনি! সেই বৈদিক যুগের ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনা ও তার বর্ণনার মধ্যে অনেক ফারাক চোখে পড়ে। ব্রাহ্মণ (আর্য) ও মুসলমানদের এ উপমহাদেশে আগমন, বর্ণবৈষম্য, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি ভারতবর্ষে দেখেছি বিকৃতভাবে প্রচার করতে। পারস্পরিক প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণে সত্যানুসন্ধানের তুলনায় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব করে নিজের কোলে ঝোল টানার প্রবণতা বেশি দেখেছি। আমাদের নতুন প্রজন্মের অতীত অনেক কিছুই আত্মানুসন্ধানে জানা প্রয়োজন। বেশি কথা এখন থাক। '৭১-এর স্বাধীনতার অল্প আগে ও পরের কথা বললেও শেখ মুজিবের কোনো সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশক ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। তার অপ্রকাশিত বিপরীতমুখী কর্মকাণ্ড আমাদের অনেকের জানা। '৭১-এর ৭ই মার্চের অনেক কথাই ছাত্র নেতারা তাকে দিয়ে জোর করে বলিয়েছিল বলে জানা যায়। তিনি একবার বলেছেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', আবার এর পর-পরই পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সাথে দেন-দরবারে বসেছেন অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য। ২৫শে মার্চে গণহত্যার পর হরতাল ডেকেছেন; আবার বলেছেন, 'যা, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোগে'। এ ছাড়া আরো অনেক স্ববিরোধীতার কথা ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়েও একই অবস্থা। একবার তাজউদ্দীন আহমেদ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা রেকর্ড না করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, আবার আত্মগোপনে না গিয়ে স্যুটকেসে কাপড়চোপড় গোছানো চলছে পাকিস্তানের কারাগারে যাবার জন্য এবং বলছেন, 'তোরা যা, ওরা আসছে'। পুরোটাই দ্বিচারিতা। তাই নতুন বাংলাদেশের ইতিহাসকে দু-চোখ মেলে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লিখলে কেমন হয়? অনুসন্ধিৎসুজনের প্রশ্ন, তার সাথে ভারত সরকারের আগ থেকেই কি একটা অলিখিত সমঝোতা ছিল? সব কাজেই ভারত তাকে অতি বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য বলে খুঁজে পেয়েছে। একটু পেছনের কথা বলি:

ইতিহাস বলে, এ উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসার পর থেকেই উগ্র হিন্দুত্ববাদ মুসলিমবিরোধী হয়ে ওঠে। আমি ভারতে থাকতে যুবসমাজের জন্য তাদের তৈরি অনেক মুসলিমবিদ্বেষী ডকুমেন্টারি ফিল্মও দেখেছি। সে-দেশের ছাত্র-যুবসমাজকে তারা সেভাবেই শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলছে, মনের গভীরে অনেক মিথ্যা গেঁথে দিচ্ছে। মুসলমানদের তারা বরাবরই বহিরাগত শত্রু হিসেবে গণ্য করে। ভারতের মুসলমানরা নিজ দেশে বাস করেও পরদেশী; সংখ্যালঘু-'নেড়ের জাত' নামে অত্যাচার, বসতবাড়ি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ, উৎপীড়ন, নিগ্রহ, মিথ্যা অজুহাতে জীবননাশ– নিত্যকার ঘটনা, স্বপ্নহারা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

বইপত্রে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী ব্রাহ্মাণ্য-শক্তি ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগিতা করে মিলেমিশে উপমহাদেশে কর্তৃত্ব করতে থাকে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে '৪৭-এ পাকিস্তান নামে দেশের স্বাধীনতা তারা মন থেকে মানতে প্রস্তুত নয়। তারা উপমহাদেশকে চেয়েছিল 'হিন্দুস্তান' হিসেবে দেখতে। আওয়ামী লীগের মধ্যেও এ প্রবণতা লক্ষণীয়। এর পর থেকেই ভারত 'পাকিস্তান' শব্দটাকে সহ্য করতে পারে না। এ প্রতিহিংসা আজ পর্যন্ত বহাল আছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সাথেও তাদের সম্পর্ক তাই একই ছিল। এখানেও জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মুসলমান। এসব জানতে '৪৭-এ হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা ও লেখালেখি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়। তখন থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে শোষণ ও হিন্দুত্ববাদী আধিপত্য বিস্তারের গোপন প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি অবহেলা, বৈষম্য ও শোষণ ভারতের কু-মতলব বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে। '৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ভারত সে স্বাধীনতাকে মেনে নেয় না, এদেশকে তারা তাদের একটা আশ্রিত রাজ্য হিসেবেই গণ্য করে এবং সেবাদাস দিয়ে শাসন শুরু করে।

তাদের আশা ও চেষ্টা, এদেশে যারা টিকে থাকবে তারা হবে ভারতের নির্ভেজাল হুকুম বরদার ও মুসলিমবিদ্বেষী। এজন্য আগে প্রয়োজন মুসলমানি চিন্তাধারায় পুষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ঠুনকো অজুহাতে দমিয়ে রাখা, খতম করা; নামের সাথে জঙ্গিবাদের ট্যাগ লাগিয়ে বিশ্বব্যবস্থা থেকে একঘরে করে ফেলা। দেশটাকে লুটপাট করে খাওয়া ও বাণিজ্যিক পশ্চাৎভূমি হিসেবে ব্যবহার করা। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের হিন্দত্ববাদী শাসক-সহায়ক গোষ্ঠী এবং '৪৭ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত ভারতের শাসক গোষ্ঠী এ উপমহাদেশ থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা বিলীন করার মতলবে নিয়োজিত। '৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই আওয়ামী শাসকদের সঙ্গে নিয়ে এ প্রক্রিয়া পুরাদমে চলে আসছে। এসব কাজে এদেশের বেশকিছু তথাকথিত মুসলমান নামধারী 'মীর-জাফর', জার্নালিস্ট, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিবাদী গোলামদের মগজ ধোলাই করে ইসলামবিদ্বেষী চাটুকার তৈরি করার প্রয়োজন ভারতের নীলনকশার অংশ ছিল। সে-কাজে তারা বেশদূর সফলকামও হয়েছে। এখন এদেশে ব্রিটিশও নেই, পাকিস্তানও নেই। ভারতের পোষা দাসও 'স্বদেশে' ফিরে গেছে। এখন এদেশের স্বাধীনতা-স্বয়ম্ভর মানুষ এদেশকে আর দিল্লির অবাধ চারণভূমি হতে কোনোক্রমেই দেবে না।

ভারতের পরিকল্পনায় বিডিআর বিদ্রোহের নামে সেনাবাহিনীর অফিসার নিধন, শাপলা চত্বরে ধর্মপ্রাণ আলেম-ওলামাদের গণহত্যা, সাধারণ প্রতিবাদী মানুষ ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের অমানবিক নির্যাতন, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ১৫ বছর ধরে নির্বিচার হত্যা-গুম তাদের নীলনকশার সফলতার অংশ। শেষে গণহত্যা করেও সাধ মেটেনি, হাজার হাজার সেবাদাস প্রভুর চরণে জীবন সঁপে দিয়েছে। সেখানে বসে প্রভুর সঙ্গে যোগসাজশে এখনও মুসলিম নিধন ও দেশ-দখলের গোপন ষড়যন্ত্র অবিরাম চলছে। একটা শ্রেণি কত অবিবেচক, ইতরতুল্য নির্মম-পাষণ্ড হৃদয়ের সেবাদাস হলে এত কিছু করেও এক বিন্দু পরিমাণ অনুশোচনার গ্লানি তাদের আত্মসচেতনতাকে স্পর্শ করে না! ভারত ও এর সেবাদাসদের এই মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব থেকে এদেশ কখনোই মুক্তি পাবে কিনা– আমার সন্দেহ প্রকট।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে অজস্র আওয়ামী-লীগারের মনের ভাবধারা আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, তাদের অধিকাংশ অবিভক্ত ভারতে বিশ্বাসী। এ কারণেই ভারতের সাথে এদের এত গাঁটছড়া, নিজের দেশকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। আমার মনে খটকা লাগে, বাপের অস্তিত্ব না থাকলে ছেলের অস্তিত্ব থাকে না, আবার দাদার অস্তিত্ব না থাকলে বাপের অস্তিত্বও থাকে না; এ বুঝটুকু কি বাংলাদেশী নামধারী ভারতীয় দাসদের মাথায় নেই? এদের কাছে স্বাধীনতা শব্দটা অর্থহীন। এরা ক্ষমতা ও স্বার্থলোভী। আবার অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও আত্মকলহে মত্ত, কেউবা আত্মবিস্মৃত। কেউ আবার অতীতের স্বকীয় কুলগৌরব ও কুলধর্ম বিসর্জন দিয়ে মতাদর্শে সেবাদাসদের স্থলাভিষিক্ত হতে চায়। এটা আত্মবিনাশক ও কুলনাশক।

'৭১-এর স্বাধীনতাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। '৭১-এর স্বাধীনতা এসেছিল বলেই জুলাই '২৪-এ ছাত্র-জনতার অসমাপ্ত বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল; '৪৭-এ পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল বলেই '৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছিল। তবে আওয়ামী লীগ যে ভারতের স্বার্থরক্ষা, নিরঙ্কুশ-নির্লজ্জ দালালী, অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও তাদের স্বার্থ দেখভালের জন্য এদেশে জন্ম নিয়েছিল, এ বুঝ এতটা বছরে আক্কেলজ্ঞানসম্পন্ন সবার কাছেই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত অনেক সেবাদাসের কাজ শেখ হাসিনার হাতে সমাপ্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগও এদেশ থেকে নিঃশেষ হয়েছে। তাদের এসব কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল, গুম-হত্যা, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, রিলিফ লুটপাট, মুজিববাদী শাসন, রক্ষীবাহিনীর জুলুম, বাকশাল কায়েম, অবশেষে ১৫ বছরের হত্যা-গুম, কোষাগার চাটাচাটি, ব্যাংক লুট, টাকা পাচার, গণহত্যা ও সবশেষ সদলবলে পলায়ন বিশ্লেষণ করলে আওয়ামী লীগকে এদেশের কোনো রাজনৈতিক দলীয় সংগঠন বলা যায় না; একটা ভীনদেশী-আজ্ঞাবাহী উগ্রবাদী বর্গী-সদৃশ

লুটেরাগোষ্ঠী বলা যায়। এদেশে তাদের রাজনীতির নামে দস্যুবৃত্তি সমূলে শেষ, যদি বাংলাদেশীদের স্বদেশী চৈতন্যোদয় হয়। এখন থেকে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং ৫ই আগষ্ট 'স্বাধীনতাবিরুদ্ধ উগ্র হিন্দুত্ব-আধিপত্যবাদের সেবাদাসমুক্ত দিবস' বলে পালন করা যায়।

ভাবনা অন্যখানে। এই লুটেরাগোষ্ঠী সুদীর্ঘ বছর ধরে এদেশের জনগোষ্ঠীকে দুর্নীতি-দুরাচারবৃত্তি, অপমানসিকতা ও সেবাদাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে পালিয়ে গেল, এখন এই সামাজিক জন-আপদের কী দশা হবে? এই জন-আপদকে সুশিক্ষিত ও জনসম্পদে পরিণত করার কাজটা কি এতই সহজ? এর জন্য অবশিষ্ট দলগুলোর মধ্যে যে দেশাত্ববোধ, মতৈক্য, সততা থাকা অপরিহার্য, তা কি এদের মধ্যে আছে? এতটা বছরে দেশপ্রেমী দলগুলোর মধ্যে যে বোধোদয় জন্ম নেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা কি এদের মধ্যে জন্মেছে? এরা দুরাচার-দুর্বৃত্তায়ন-চাঁদাবাজ প্রতিপালন করবে, না-কী ইতিহাসের সত্য নিয়ে, স্বকীয়-স্বাধীন অস্তিত্বের কথা ভেবে সেমতো দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করবে? জুলাই '২৪ এর পর এই সাত মাসে কোনো রাজনৈতিক দল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কারো প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা এ জনগোষ্ঠীকে সচেতন, সুশিক্ষিত ও মানবসম্পদে পরিণত করার এবং স্বাধীন দেশোপযোগী ব্যাপক শিক্ষা-সংস্কারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ তো চোখে পড়লো না। অন্তর্বর্তী সরকারের অন্য বিষয়ে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয় ও বৈদেশিক বিষয়ে সফলতা আছে মানি, কিন্তু এ বিষয়ে, অর্থাৎ সুশিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরির বিষয়সহ অন্তর্নিবিষ্ট সব সমস্যাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। সমাজের মগজ পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। নীতি-নৈতিকতাভিত্তিক সমাজ-সংস্কার ও স্থায়ী শিক্ষা-কমিশন প্রতিষ্ঠার দাবিও অনেক লেখায় করেছি। আবার ভবিষ্যৎ আশার আলোও তেমন চোখে পড়ে না। রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ লোকজন ক্ষমতায় গিয়ে দেশের কোষাগার চাটার চিন্তায় বিভোর। তাহলে পরিণতি কী? 'আকলমন্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি হ্যায়। সত্য কথাগুলো শুনতে তিক্ত ও বিস্বাদ লাগে তো বটেই।

প্রয়োজন ছিল এদেশের বাদবাকি রাজনৈতিক দল, নেতারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও স্বনিয়ন্ত্রিত হয়ে দেশকে টিকিয়ে রাখা ও দেশের উন্নতির পরিকল্পনা করা। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থবাদী একটা মহল দেশের উন্নতি, শিক্ষার মান, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, ইন্টিগ্রিটি, দেশপ্রেম নষ্ট করে দিয়ে দেশ ধ্বংসের সকল উপাদান বজায় রাখতে চায়; এদের চিহ্নিত করা দরকার। ভাবা প্রয়োজন যে, নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন মানে উন্নতি নয়, উন্নয়নের পূর্বশর্ত মাত্র। সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি-চাঁদাবাজী, হাট-ঘাট-মাঠ দখল, শোষণ ও আইনহীনতার তেমন কোনো উন্নতি হবে কি? অনেক দলে অনেক প্রগতিবাদী-ইসলামবিদ্বেষী নেতা জায়গা দখল করে নিয়েছে। নিজের বাপ-দাদার অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তারা প্রগতিবাদী হয়েছে। আমার জানা মতে, যে জাতি তার অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে অসার আদর্শের চরণে জীবন ও কর্মকে সঁপে দেয় তারা পরজীবী ও নিঃস্ব ছাড়া আর কী হতে পারে! তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ও নিজের নাম যদি এতই অচ্ছুত ও জঙ্গীমনা হয়ে থাকে, তাহলে তারা এদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্মীয় সত্ত্বা বজায় রেখে কিভাবে সুশিক্ষিত মুসলমান বানানো যায়, সে পরামর্শ খয়রাত করতে পারে, দোষত্রুটি সংশোধন করিয়ে নিতে পারে; তাদেরকে গড়ে তুলতে পারে, এতে তো দোষের কিছু নেই। তবে আত্ম-বিস্মৃতি ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এদেশের বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়কে এদেশ (জন্মভূমি) থেকে বিতাড়িত করা বা ধ্বংস করার মানসিকতা নিয়ে দেশব্যাপী বস্তুবাদ ও হিন্দুত্ব-আধিপত্যবাদের তালিম দেওয়াকে তো কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

দেশের অব্যবস্থা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, অপশাসন ইত্যাদির খোল-নলচে বদল করার এখনই সময় এসেছে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা কোনোক্রমেই সংগত হবে না। ক্ষমতালোভী অনেকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে পরিবেশকে নষ্ট করে দিতে চাইবে। তাতে নির্দিষ্ট কোনো দল বা গোষ্ঠী লাভবান হবে নিশ্চয়ই, তবে দেশ গড়ার উপযুক্ত সময় হারাবে

জনসাধারণ। ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী মহলের কি এত তাড়াতাড়ি চৈতন্যোদয় হবে? সত্য তথ্য লিখে সংরক্ষণ করারও এখনই উপযুক্ত সময়। বাংলাদেশে '৭২ সাল থেকে আওয়ামী শাসন সম্পর্কীত দুঃশাসন, নির্বিচার-হত্যা-গুম ও লুটপাট-গণহত্যার বিষয় এবং অগণিত মানবতাবিরোধী লোমহর্ষক ঘটনা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সংশ্লিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয়কে কোনো ইতিহাসভিত্তিক প্রজেক্ট হাতে নিতে এখনও দেখিনি। এ বিষয়ে ছোটগল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, স্মৃতিকথা, প্রামাণ্য-রচনা, প্রকাশিত খবর একত্রিকরণসহ অনেকেই অনেক কিছু লিখতে ও সংরক্ষণ করতে পারেন। একটা কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রজেক্টের পক্ষ থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায়। রচয়িতাকে কিছু সম্মানীও দেওয়া যায়। বর্তমান প্রজন্মও সত্য অতীত জানতে পারে, শিখতে পারে। এতে জাতীয় সম্পদ গড়ে ওঠে। বিষয়টা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংশ্লিষ্ট পক্ষ ভেবে দেখতে পারেন।

(২৭.৩.'২৫, দৈনিক শিক্ষাবার্তা ডট কম-এ প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদঃ সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web page: pathorekhahasnan.com